তারিখ 25 NOV 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

দৈনিক বাংলা

সার্বজনীন সাক্ষরতা

সার্বজনীন সাক্ষরতা আমাদের ঘোষিত লক্ষ্য হলেও এই লক্ষ্য থেকে আমাদের বাস্তব অবস্থান অনেক দূরে। গত বিশ বছরে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সাফল্য নেতিবাচক বললেও খুব ভুল হবে না। সত্তরের দশকের শুরুতে অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্মলগ্নে এখানে শিক্ষার হার ছিল ২১ শতাংশ। এখন এই হার কেউ বলেন ২৬ শতাংশ, কেউ বলেন ৩০ অথবা ৩৩। এই পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ নির্ভুল না হবার সম্ভাবনা আছে। মোটামুটিভাবে ধারণা করা যায় জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী শিক্ষিত নয় এখানে। একটা স্বাধীন দেশের জন্য বিষয়টা গৌরবজনক নয় অবশ্যই।

সম্প্রতি বাংলাদেশ গণসাক্ষরতা সমিতির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস পাঁচ বৎসরের মধ্যে সার্বজনীন সাক্ষরতার লক্ষ্যে শিক্ষা আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিরক্ষরতার হার বাড়ছে। আমাদের ২৫/৩০ বছর বসে থাকবার সময় নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন। নিরক্ষরতার হার বাড়ছে এটা আমাদের জন্য উদ্বিগ্ন হবার মত কথা নিশ্চয়। শিক্ষামন্ত্রী জমিরুদ্দিন সরকারও বলেছেন শিক্ষার হার কমছে। বোঝা যাচ্ছে, বসে থাকার অবকাশ সত্যিই নেই। আসলে উন্নয়ন চাইলে শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেই হবে। কারণ অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী নিয়ে উন্নয়নের কাজ এগোয় না। উন্নত দেশগুলির উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। শিক্ষাকে বাদ দিয়ে কোথাও উন্নয়নে সাফল্য অর্জিত হয়নি।

শিক্ষার গুরুত্ব আমরা স্বীকার করি। শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যও আমাদের আছে। কিন্তু এর পরও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে তেমন অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে না এর কারণ কি? কারণ হয়ত একাধিক তবে মূল কারণ দারিদ্র্য এটা প্রমাণিত সত্য। শিক্ষায় দারিদ্র্যের প্রতিকূল প্রভাব দূর করার লক্ষ্যে ছেলেদের জন্য পঞ্চম শ্রেণী এবং মেয়েদের জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার খাতা-বই বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে এর পরেও পরিস্থিতির খুব উন্নতি হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গন থেকে ড্রপ আউটের সংখ্যা রোধ করা যায়নি। ইউনিসেফের বাংলাদেশস্থ প্রতিনিধি দেখিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয়িত সম্পদের ৬৫ ভাগ অপচয় হয়। লক্ষ্য অর্জনের পথে অপচয় সর্বত্র এখানে বাধার সৃষ্টি করে একথা ঠিক। শিক্ষা খাতের অপচয় সামাল দেয়া কঠিন। কারণ শিক্ষা বিস্তারে সাফল্য চাইলে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। ইউনিসেফ প্রতিনিধি বলেছেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের শতকরা ৮০ জনকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ধরে রাখতে পারলে ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ৭৫ ভাগ মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠবে। কিন্তু বিদ্যালয়ের ড্রপ আউট রোধ করা যায় না কেন সেটাও বিবেচনার বিষয়।

আমরা সবাই জানি এদেশের অন্তত সত্তর শতাংশ শিশুকে জীবিকার কথাও ভাবতে হয়। বিনামূল্যে বই-খাতা পাওয়া গেলেও অনেকের পক্ষে সেজন্যেই স্কুলে যাওয়া সম্ভব হয় না। এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য শ্রমজীবী শিশুদের জন্য ভিন্ন সময়ে স্কুল বসাবার ব্যবস্থা আছে। তবে এর ফলে শিশুদের ওপর যে বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয় তা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। বস্তুত বিষয়টা খুবই জটিল। এ সমস্যার সমাধান কিভাবে সম্ভব তা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। দরিদ্র শিশুদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা যায় কিনা, ছিন্নমূল শিশুদের জন্য হোস্টেল গড়া সম্ভব কিনা বিবেচনা করে দেখা যায়। দেশের অর্থবান লোকেরা সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারেন।

দারিদ্র্য এবং অশিক্ষার সহাবস্থান স্বাভাবিক হতে পারে। এই দুটি অবস্থা থেকে মুক্ত হবার উদ্যোগও খুবই সম্পর্কিত। অশিক্ষা দূর না হলে দারিদ্র্যও দূর হয় না। আবার শিক্ষা বিস্তারের পথে দারিদ্র্য বাধা সৃষ্টি করতে পারে। তবে আমাদের লক্ষ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। অশিক্ষা এবং দারিদ্র্য দুটোই আমরা দূর করতে চাই। আমাদের চেষ্টা আন্তরিক হলে এক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনও সম্ভব।